সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৭ ভাদ্র ১৪২২ ● সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ● ২ টাকা

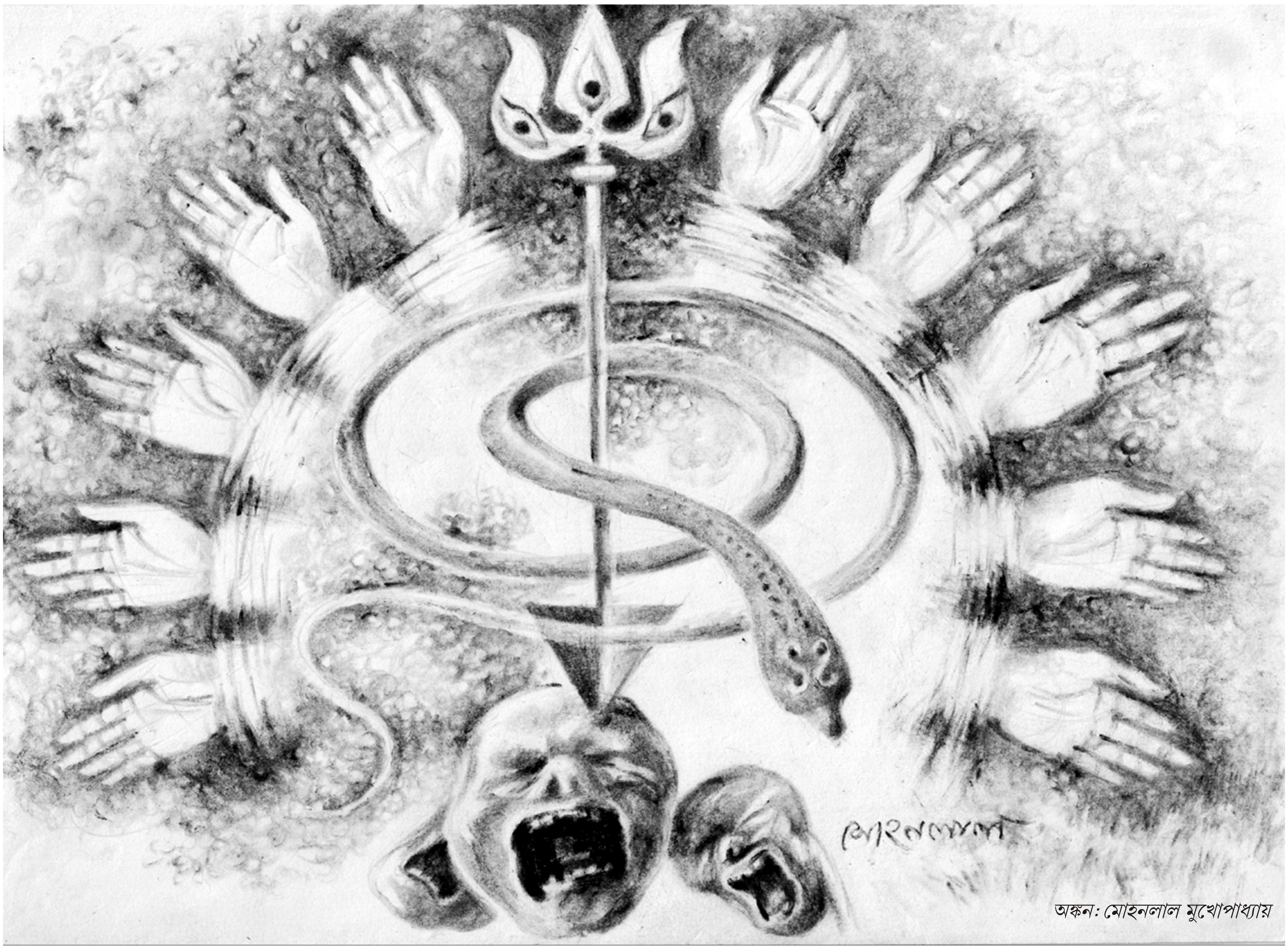

অঙ্কন: মোহনলাল মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা

একরাম আলি

ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। মাঠে মাঠে কাশফুলের দল ভিজে নেতিয়ে গেছে। তবু তাদের সাদা রঙ সবুজ ধানখেতের মাঝে ঝকঝক করে জানিয়ে দিচ্ছে -- এখন শরৎকাল। দূর থেকে ওপরের এমন সৌন্দর্য দেখা যায়। যদি নেমে পড়া যায় মাঠে, দেখব প্রকৃতির গহীন রূপটিকে। সেখানে খিদে আর খিদেপূরণের লড়াই। সবুজ ধানের গোড়ায় জল। সেই জলে কত না পোকামাকড়, শামুক, গুগলি, জোঁক আর দলের সেরা সাপ। মানুষ ঘুরছে। তারা দেখছে, ধানের গাছ কত বড় হল। তারও ক্ষুধানিবৃত্তির স্বপ্ন।

খিদে কী করে মেটে? খাবার পেলে। ক্ষমতা পেলে। সোজা পথে। বাঁকা পথে। প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এইসব সোজা-বাঁকা পথ। শুভ, অশুভ।

অশুভকে দূর না করলে শুভর প্রতিষ্ঠা হবে কী করে? খিদে অশুভ। বাঙালির খিদে দূর হয় অন্নে। শরতের পর হেমন্তে ধানরূপে সেই অন্নের আগমন। শরৎকাল সেই অন্নেরই আগমনীবার্তা নিয়ে আসে বাঙালির ঘরে-ঘরে। আর অন্নপূর্ণার। দুর্গার। তাঁর আকাঙ্ক্ষা -- আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। মাকে -- কন্যাও তো মা-ই -- তাই বরণ করে বাঙালি। এ এক স্মরণ।

কেননা, সবই আমরা ভুলতে বসেছি। আছে শুধু স্মরণটুকুই। এই স্মরণটুকুই এখন বাঙালির ভরসা। স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।

দশভুজা

প্রতিভা সরকার

পুজো তো এসেই গেল। উৎসাহীরা বাজার শেষ করে ফেলেছেন। স্কুলকলেজে ভাসছে পুজো পুজো গন্ধ। বাচ্চাদের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। প্রবাসীদের টিকিট কাটাও শেষ অনেক দিন।

মন্ডপে আমরা যখন প্রতিমা দর্শন করি এবং দুর্গার রূপে মোহিত হই, জোর আলোচনা চলে অলঙ্কারের শোভার, কাঠামোর বিরাটত্ব অথবা মণ্ডপের অসাধারণত্বের, তখন কিন্তু কেউ মনে রাখে না দেবীর ভুবনমোহিনী শোভার পেছনে রয়েছে অনেক সাধারণ মানুষের প্রাণপাত পরিশ্রম -- বিশেষত কুমোরপাড়ার কারিগর ও অন্যান্য শ্রমিকদের কথা। বিদেশে প্রতিমা পাঠাবার সূত্রে উঠে আসে কখনও রমেশ পাল, কখনও মোহনবাঁশি রূদ্র পাল বা পরেশ পালের কথা। কিন্তু কখনও আলোচিত হন না চায়না পাল বা মালা পালের মত মহিলা রূপকাররা। অথচ এরা পিছিয়ে নেই কোথাও। না দক্ষতায়, না শ্রমে, না শিল্পবোধে।

কুমোরটুলির সরু অন্ধকার গলিতে বাস করেন মালা ও চায়না। নিজের স্টুডিও থাকা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করেন কাক-ডাকা ভোর থেকে মাঝরাত অবধি। প্রচণ্ড লড়াকু এই মহিলারা বলে যান তাঁদের অমানুষিক সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠা পাবার কাহিনী।

খেলাচ্ছলে ছোট ছোট ধুলোমাখা হাতে পুতুল বানালেও শিশুকালে চায়না কখনও ভাবেননি

এরপর ৩ পাতায়

বিশেষ সংবাদ *সেবা নিবাসের তিনতলায় নবনির্মিত ১১টি ঘর রোগীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।*

সেবা নিবাসের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন

উৎপল ঘোষ

গত ১৬ই অগাস্ট, রবিবার সঙ্ঘ ভবনের তিনতলায় সেবা নিবাসের নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন হল। দুই শয্যা বিশিষ্ট এগারোটি ঘর তৎসংলগ্ন চারটি শৌচাগার ও স্নান ঘরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হতে সময় লাগে ছয় মাস। ঘরগুলিকে সুসজ্জিত করতে অর্থাৎ খাট, বিছানা, বাসনপত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন সরঞ্জাম সরবরাহ করতে আরও দু'মাস সময় লাগে। মোট ব্যয় হয় ১৩ লক্ষ টাকা। সঙ্ঘের সীমিত সঞ্চয় এবং সহৃদয় সদস্য-সদস্যা ও মহানুভব ব্যক্তিদের অনুদানে এই মহৎ কর্মকাণ্ড সুসম্পন্ন হয়। সেবা নিবাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি ডঃ হিরণ্ময় সাহা। সেবা নিবাসের অংশের উদ্বোধন করেন চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস, উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। ছিলেন পরিবেশবিদ ও নদী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ডাঃ সুধীন ভট্টাচার্য। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার গবেষক ও সঙ্ঘের ক্যান্সের বিভাগের পরমর্শদাতা ডাঃ অসীম চ্যাটার্জি, সঙ্ঘের কার্যকারী সভাপতি ডঃ হিরণ্ময় সাহা, সাধারণ

সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা, ডাঃ তাপস কুমার চট্টরাজ, শ্রী পঙ্কজ দত্ত, কাউন্সিলর শ্রী অরূপ হাজরা প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল। সভায় মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু বহুমুখী জনসেবা প্রকল্পগুলির বিবরণ দেন। নির্মীয়মাণ হাসপাতাল গান্ধী সেবা সদনের বহির্বিভাগে স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ নিতে সকলকে আবেদন জানান। ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস বলেন সেবা নিবাস সম্প্রসারণের ফলে দুরাগত ক্যান্সার রোগী ও পরিজনদের স্বল্পব্যয়ে আশ্রয়ের সুযোগ বৃদ্ধি হল। সঙ্ঘের এই উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে সঙ্ঘের প্রয়োজনে তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

পরিবেশবিদ অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র তাঁর বক্তব্যে সর্বসাধারণের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ এবং সেবা নিবাসের সম্প্রসারণের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

তিনি সুপারিশ করেন যে ভবিষ্যতে নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনের খোলা ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ প্রকল্পে তিনি যথাযথ সাহায্য করবেন। গবেষক ডাঃ সুধীন ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে ক্যান্সার রোগীদের নানাবিধ চিকিৎসা সমস্যা, দূরাগত নিম্নবিত্ত রোগীদের শহরে আবাস গৃহের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। সঙ্ঘের এই মহৎ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে তাঁর সহযোগিতা ও পরামর্শের অভাব হবে না বলে জানান।

পরিশেষে উপস্থিত সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা।

সংঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: আমাদের সঙ্ঘের গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে আঞ্চলিক মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পাঠক-পাঠিকারা বই পড়ার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান আয়োজন করতেও এগিয়ে আসছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে, ২২শে শ্রাবণ আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করি।

১৩ই সেপ্টেম্বর সঙ্ঘ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে প্রতিবছর পালিত হয়। এবারও হয়েছে। উৎসাহী পড়ুয়া সদস্যরা আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেছেন এই অনুষ্ঠানে। সমবেত কণ্ঠে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। শ্রীমতি বনাণী দত্ত, শিবানী চ্যাটার্জী, জয়ন্তী মজুমদার, দিশা কর্মকার অত্যন্ত শ্রুতিমধুর সঙ্গীত দিয়ে সকলের মনোরঞ্জন করেন। শ্রীমতি সুমনা ভট্টাচার্য্য, লিলি রায়, মালা গুপ্ত, সুকন্যা সাহা এবং দীপা দত্ত কবিতা আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মোহিত করেন। আমাদের বিশেষ সদস্য শ্রী পৃথ্বিপতি চক্রবর্তী সমবেত সকল সুধীজনকে মিষ্টি বিতরণ করেন। গ্রন্থাগারের দুই উৎসাহী কর্মী দীপা এবং গোপাকে পুরস্কৃত করা হয়। পৃথ্বীপতিবাবুর সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ আমাদের ভালো লাগে। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আরো দু'জন মানুষের কথা বলা অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ চিন্ময়কুমার দত্ত। এঁরা প্রতিদিন গ্রন্থাগারে আসেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করেন, অনেক অজানা তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সকলের কুশল সংবাদও নেন। সম্প্রতি প্রায় ১০,০০০ টাকার বই আবার কেনা হয়েছে। সঙ্ঘের প্রতিটি কাজকর্ম চলে মাত্র কয়েকজন সেবাকর্মী ও কার্যকরী সমিতির কিছু সদস্যের দ্বারা। গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডও বিশাল। নতুন বই তো প্রতিবছর কেনা হয়ই, এবং সে বই-য়ের ভাণ্ডারকে রক্ষা করা সকলেরই দায়িত্ব। সকল পাঠক ও পাঠিকার কাছে বিশেষ অনুরোধ, গ্রন্থাগারের কিছু কিছু দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থাগারকে আরও সুন্দর করে তুলুন।

শরদিন্দু-মায়া রায় ট্রাস্ট

সেবক প্রতিবেদন: প্রয়াত শরদিন্দু রায় ও তাঁর স্ত্রী মায়া রায়-এর স্মরণে তাঁদের সুকন্যা শ্রীমতি ঝিলম রায় যে ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন, সেই ট্রাস্ট থেকেই গত ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে গান্ধী স্কুলের শিশুদের পঠন-পাঠনের সাহায্যার্থে ২০ হাজার টাকা সঙ্ঘকে দান করেছেন। ঝিলমের ইচ্ছানুযায়ী ওই টাকা গান্ধী স্কুলের শিশুদের পুরস্কারের সাথে সাথে মিষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঝিলম নিজের উদ্যোগে বেশ সুন্দর কয়েকটি মেডেল তৈরি করে প্রতি শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের ওই মেডেল প্রদান করেছিল। ঝিলমের ওই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ এবং সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ দেখে আমরা সকলেই অভিভূত। শরদিন্দুবাবু ও মায়াদি সঙ্ঘের আজীবন সদস্য ছিলেন। এবং যতদিন পেরেছিলেন সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ রাখলো ঝিলম। ভবিষ্যতে স্কুলের শিশুদের নিয়ে ঝিলমের আরও কিছু পরিকল্পনা আছে তা নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে। ঝিলমের জীবন আরও বর্ণময় হোক এই প্রার্থনা জানাই।

সেবা নিবাস প্রসঙ্গে

সেবক প্রতিবেদন: আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানাই, আমাদের আশপাশের মানুষজন এবং যাঁরা গান্ধী সেবা সঙ্ঘের নানান কার্যকলাপের সম্পর্কে অবহিত, তাঁরা সব সময়েই স্বেচ্ছায় যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই ভরসাতেই আমরা দুঃস্থ ক্যান্সার রোগীদের সাহায্যার্থে একটি বিশেষ তহবিল তৈরি করেছি। এই অসম্ভব ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত কোনও মানুষকে আমরা যদি যৎসামান্য অর্থ, ওষুধ বা অন্য কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারি, তাহলে সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা পাবে। এই কাজে শ্রীমতী রেখা রায়চৌধুরি প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা সেবা নিবাস তহবিলে দান করে আসছেন। আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। গান্ধী সঙ্ঘের বিশেষ বন্ধু মনে করি। বাঁশদ্রোণি নিবাসী শ্রীমতী মীরা দে সম্প্রতি ২ হাজার টাকা দান করেছেন। শ্রীমতী আভা কর দান করেছেন ৫০০ টাকা। এছাড়া বেশ কিছু শুভার্থী মাঝমাঝেই তাঁদের বিশেষ বিশেষ দিন স্মরণ করে রোগীদের মধ্যে ফল-মিষ্টি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করে থাকেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। শ্রীমতী মৈত্রী বরাট	১০০০০ টাক
২। শ্রীমতী সুপর্ণা দেব	৫০০০ টাকা
৩। শ্রী স্বপন চ্যাটার্জি	৫০০০ টাকা
৪। শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য	৫০০ টাকা
৫। শিবরঞ্জন রায়	৫০০ টাকা

ক্রমশ

স্মরণে

সেবক প্রতিবেদন: গান্ধী সেবা সঙ্ঘের বহু দিনের সদস্যা, শ্রীমতি দীপ্তি ব্যানার্জী গত ১৯-০৮-২০১৫ তারিখে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন সঙ্ঘের কার্যকারী সমিতির সক্রিয় সদস্যা ছিলেন। সঙ্ঘের নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে সবসময়ে যথাসাধ্য আর্থিক-মানসিকভাবে সাহায্য করতেন। লেকটাউনের নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতির (A.I.W.C) সদস্যাও ছিলেন। সঙ্ঘের তরফ থেকে আমরা সবাই তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বহির্বিভাগের বিশেষ বার্তা

সেবক প্রতিবেদন: উন্নত মানের চিকিৎসা পেতে ইতিমধ্যেই গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগে জনসমাগম বেড়ে চলেছে। জুন থেকে শুরু করে আগস্ট পর্যন্ত বহির্বিভাগে আসা রোগীদের মধ্যে ৭০০ জন উপযুক্ত পরিষেবা পেয়েছেন। বিশেষ ডাক্তারবাবুরা তাঁদের সম্মতি জানিয়েছেন আগামীদিনে পরিষেবা দেওয়ার। অঞ্চলের সকলের জন্যই এই পরিষেবা উন্মুক্ত রইল। প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরাক্ষীর জন্য ইউনিমেড ও অ্যাপোলো ক্লিনিক যশোর রোডের সঙ্গে অল্প খরচে পরিষেবা দেওয়ার জন্য গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছে।

দশভুজা

১ পাতার পর

প্রতিমা নির্মাণ তার পেশা হবে। কুমোরটুলির কোনও মেয়েই তা ভাবতে পারতেন না, যদিও বাবা, স্বামী-পুত্রের সৃজনশীলতার আড়ালে তাদের অবদান অনেক। তাই কি করে ঠাকুর গড়তে হবে তা জানা থাকলেও বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে তরুণী চায়না যেন অথৈ জলে পড়েছিলেন। বাবা বেঁচে থাকতে প্রকাশ্যে দোকানে

চায়না পাল

এসে বসাও যখন বারণ ছিল, অথচ সেই চায়না ২০১১ সালে বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী হিসাবে রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন। নিজের তৈরি ঠাকুর উদ্বোধন করেছেন কুমোরটুলি সার্বজনীন, সল্টলেক বিসি ব্লক, হাইল্যান্ড পার্ক ও আরও অগুন্তি জায়গায়। বাবার দোকানের পুরোনো কারিগররা যাকে কাজ শেখাতে প্রত্যাখান করেছিলেন, আজ কম করেও কুড়িজন কারিগর তার কাছে কাজ করে সারা বছর অন্নসংস্থান করেন। বিরুদ্ধতা কম সইতে হয়নি তাকে। মৃদুভাষী চায়না বলেন, কত কেঁদেছি জানেন। সবার দোকানের বাইরে রাস্তার ওপর তাদের ঠাকুর রাখছে, আমি রাখলেই এলেমেলো কথা!

কিন্তু নিজের শিল্পবোধকে এলোমেলো হয়ে যেতে দেননি এই শিল্পী। কাজের দাবি আর প্রতিষ্ঠার চাপে বিয়ে করা বা সংসার বসানো হয়ে ওঠেনি তার। কোনও খেদের সময়ও নেই। ভোর চারটেয় স্নান সেরে ঠাকুরপুজো, তারপর খাবার নিয়ে স্টুডিও। মাঝরাত অবধি। পুজো কাছে চলে এলে সেই খাবার মুখে তোলার সময়টুকুও থাকে না।

আর এক কুমোরটুলি কন্যা মালা পাল। তাকেই ব্যস্ততমা বলে মনে হল। পটুয়া পরিবারের এই শিল্পীর মিনিয়েচার দুর্গার খ্যাতি সারা দেশ জুড়ে। প্রচুর পুরস্কার, খবরের কাগজের কাটিং, ছবি, ইন্টারভিউ, অ্যালবাম দেখালেন। দশ-পনের জন যোগাড়ে ওর অধীনে থাকে বার মাস। সংসারের অন্য সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রান্নাও মালা নিজেই করেন। নিজের রুগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও প্রচুর ওয়ার্কশপ করেন সরকারি উদ্যোগে। সদ্য শিলিগুড়িতে ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে একটি কর্মশালা করে ফিরেছেন। অনেক দিনের চেনা কোনও বিশ্বাস ভাজনকে জিজ্ঞাসা করার মত আমাকেই প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা, এই যে আমি এত ক্যান্সার রোগীর সঙ্গে ওঠাবসা করলাম,এতে আমার কোন ভয়নেই তো?'

তবে এখন উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরাও প্রতিমা গড়তে এগিয়ে আসছেন। যেমন সুস্মিতা রুদ্রপাল। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনির্ভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতায় এমএ করেছেন তিনি।

সুস্মিতা পাল

এখনও পুরো ঠাকুর গড়া হয়ে ওঠেনি তাঁর, এখনও তিনি সাজশিল্পী, যিনি প্রতিমার সাজসজ্জার সব উপকরণ যোগান। কিন্তু মালা ও চায়নাকে অনুসরণ করে এই শিল্পকেই পেশা হিসেবে নিতে চান, আশা রাখেন অদূর ভবিষ্যতেই তৈরি করে ফেলতে পারবেন পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা। কুমোরটুলির মেয়েদের অবস্থার একটি চিত্র পাই তাঁর বিশ্লেষণে। প্রায় সব মেয়েরাই এখন স্কুলে যায়, খোলা স্টুডিওতে কাজ করারও কোনও বাধা নেই, কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠা এখনও দূর অস্ত। জরি, পুঁতি ও শোলার কাজে এখনও বেশির ভাগ জুড়ে আছে নারীর ছায়া-শ্রম, অর্থাৎ

মালা পাল

সংসারের যাবতীয় কাজের পর পুরুষের থেকে কম মজুরিতে নারী শ্রমিকের হাড়ভাঙা খাটুনি।

মজুরি যদি একই থাকতো, সুস্মিতা হিসেব করে দেখিয়ে দেন, তাহলেও নারী বঞ্চিত হত। পুরুষ মানুষ সংসারের প্রধান উপার্জনকারী এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে খাটতে পারেন নিজেকে কোন সময় সীমায় আবদ্ধ না রেখে। দিনে ১০ ঘন্টা খাটলেও কেউ কিছু বলবে না। সেখানে একজন নারী শ্রমিক সংসার ও সন্তান সামলে খাটতে পারেন বড়জোর ৫ থেকে ৬ ঘন্টা। ফলে মজুরি এক যদি হতো, তবুও ঘন্টার হিসেবেই নারীর রোজগার হত কম। বোঝাই যায় সেকেন্ড সেক্স-এর তকমা সহজে ঘোচবার নয়।

তবু চাকা গড়িয়ে চলেছে কুমোরটুলি কন্যাদের জীবনে। একটু একটু করে হলেও তারা এগিয়ে চলছে স্বনির্ভরতার দিকে। এমন একদিন হয়তো আসবে যেদিন অনেক চায়না, মালা ও সুস্মিতার তৈরি অপূর্ব প্রতিমা কলকাতার সব পুজো মণ্ডপ আলো করে থাকবে।

দক্ষিণ পাতিপুকুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও কিছু কথা

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বাগজোলা খাল থেকে জোড়া রেলপোল পর্যন্ত পাতিপুকুরের এলাকা। যশোর রোড পাতিপুকুরকে উত্তর এবং দক্ষিণ -- এই দুই অংশ ভাগ করে দিয়েছে। উত্তর অংশ প্রায় দমদম রোড পর্যন্ত এবং দক্ষিণ অংশ ভি আই পি রোড পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাংশে বসাকবাগান, কালিন্দি, হাজরাপাড়া, নস্করপাড়া আর দক্ষিণাংশে বাঙুর কলোনি, বরাট কলোনি, লেকটাউন, শ্রীভূমি, দক্ষিণদাড়ি এবং পাতিপুকুর অঞ্চল।

দক্ষিণাংশে মনুষ্যবসতী হয়েছে বলতে গেলে স্বাধীনতার পরে। বাঙুর অঞ্চল ছিল হোগলা বন। বাঙুর আর বরাট কলোনির মাঝখানে বড় বড় কারখানা। বরাট কলোনির পরে লেডি প্রেসটন কলোনি। সরকার অধিগ্রহণ করার পর এর নাম হয় লেকটাউন। যদিও খাতায়-কলমে এর নাম ছিল পাতিপুকুর টাউনশিপ। লেকটাউনের দক্ষিণে এবং ইস্টার্ন পেপার মিলের জমিতে গড়ে ওঠে পাতিপুকুর ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। বাঙুর ও লেকটাউনের মত এখানেও জমি প্লট করে বিক্রি করা হয়। পরে এই অংশের নাম হয় শ্রীভূমি। বাকি অংশ পাতিপুকুর ও দক্ষিণদাড়ি নামেই থেকে যায়। পাতিপুকুরের আয়তন খুবই ছোট হয়ে যায়। এস কে দেব রোডের দু'পাশের অঞ্চলকে কিছুটা বিস্তৃত করে পাতিপুকুর বলা হতে থাকে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের বিরাট সংখ্যক মানুষ বাস্তু ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাঁদের আশ্রয় দেওয়া সরকারের পক্ষে এক অচিন্তানীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এস কে দেব রোডের দু'পাশে কলকাতার জমিদারদের বেশ কয়েকটা বাগানবাড়ি ছিল। এই বাগানবাড়িগুলি দখল করে তাঁরা কলোনি পত্তন করেন। দক্ষিণ পাতিপুকুরে ১, ২, ৩ এবং ৪ নম্বর পল্লিশ্রী কলোনি সৃষ্টি হয় এইভাবে।

যশোর রোডের দক্ষিণ পার্ট দিয়ে চলত ছোট রেলগাড়ি। মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি ছিল মালিক। বেলগাছিয়া ট্রামডিপোর সামনে থেকে শুরু করে যেত বসিরহাট পর্যন্ত। কলকাতা ও আশপাশের থেকে আনাজ এবং মানুষের আনাগোনায় এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছিল। কিন্তু লোকসানের অজুহাতে ওই পরিবহণ ব্যবস্থার ইতি ঘটে। এমনকি রেললাইন তুলে ফেলা অলাভজনক বলে তা মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য রেল-পরিবহণের স্থান দখল করে লরি। রেলের জায়গার তেঁতুলতলার দু'পাশে বহু আবাসন গড়ে ওঠে রেল কোম্পানির মালিকানায়।

তেঁতুলতলার ভেতরে আদ্যনাথ সাহা রোড এবং পীযূষ ঘোষ রোডের ওপরে যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের অনেকেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হলেও খাঁটি উদ্বাস্তু নন। আগে থেকেই তাঁরা জীবিকা অর্জনের জন্য কলকাতায় বসবাস করতেন এবং পাতিপুকুরে আসেন স্থায়ী বসবাসের জন্য। উদ্বাস্তু কলোনিতে যাঁরা স্থান পেলেন তাঁদের অনেকেই মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন, ফলে সরকারি সহায়তায় একটা চাকরি শেষ পর্যন্ত জুটেছিল। সামান্য হলেও কিছু অর্থনীতির পরিবর্তন তাঁদের জীবনে আসে।

পূর্ববঙ্গের মানুষের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে তাঁদের আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক না কেন শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ থেকেই এই অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উৎসাহ দেখাতে থাকে। এরই ফলস্বরূপ আমরা পাই পাতিপুকুর আদ্যনাথ শিক্ষা মন্দির। স্বর্গীয় আদ্যনাথ সাহা মহাশয়েব পরিবারের সহায়তায় জমি পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে তখন এদের মধ্যে কিছু নাটক পাগল লোক নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলো। নতুন পল্লীর মুখে যে পাঁচিল ঘেরা বাড়িটা দেখি ওটাই নাটক করার জায়গা হিসাবে বেছে নেওয়া হয় এবং ওর নাম হয় থিয়েটার বাগান। নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার ফলে যাঁরা এখানে বাস করতেন তাঁদের কাছে আর বিশেষ বিরাগভাজন হতে হত না। বরং বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল এই বাস্তুহারারা।

এস. কে. দেব রোড এই অঞ্চলের প্রধান রাস্তা। তেঁতুলতলার মোড়ে শুরু হয়ে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সামনে শেষ। ক্যানাল স্ট্রিট চলে গেল ভি. আই. পি. রোডের দিকে আর পশ্চিম দিকে গেল দক্ষিণদাড়ি রোড রেল লাইন পার হয়ে। এই দক্ষিণদাড়িতে বেশ বড় বড় কারখানা ছিল। ইস্টার্ন পেপার মিল, বার্ড কোম্পানি, হার্ডিঞ্জ জুটমিল, যেখানে বহু লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

দক্ষিণ পাতিপুকুর অঞ্চলে যত মধ্যবিত্ত লোক বসবাসের জন্য আসতে থাকে এ অঞ্চল তত উন্নত হতে থাকে সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে। কলোনিগুলোতে এতদিন ভোগ দখলের অধিকার ছিল কিন্তু পরে সর্বস্বত্ব দেওয়া হয়। মানুষের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে জমি তো তত বাড়ছে না। ফলে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গৃহনির্মাণ ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে। এর ফলে প্রোমোটারি ব্যবসার রমরমা দেখা দেয়। কলোনিবাসীদের এতে লাভই হয়। তারা জায়গার বিনিময়ে নগদ অর্থ এবং উন্নতমানের বাসস্থান লাভ করে।

এবার বলি এতদ্ অঞ্চলের সব থেকে প্রচীন দক্ষিণ পাতিপুকুর দুর্গোৎসবের কথা। ৬২ বছরের পুরোনো এই দুর্গোৎসব। ৬২ বছর আগে এ অঞ্চলটি খুব নিচু ছিল। প্রধানত চাষের জমি ছিল। কিছু উদ্যোগী মানুষ যেমন শ্রী গৌরাঙ্গ বণিক, শ্রীযুক্ত মাণিক্যরতন গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত খুব ছোটো করে সামান্য চাঁদা তুলে দক্ষিণ পাতিপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের গোড়াপত্তন করেন। পূজার আড়ম্বর কম থাকলেও আন্তরিকতা ছিল -- যা আজও বর্তমান। প্রথমে লোক সংখ্যা কম ছিল -- ধীরে ধীরে মনুষ্যবসতি বাড়ায় পুজোর উজ্জ্বলতা বাড়তে থাকে। এই পুজোর বিশেষত্ব -- কোনও ক্লাব এর পরিচালনা করে না। স্থানীয় মানুষ পুজোর আগে মিলিত হয়ে দুর্গোৎসবের কার্যকলাপ ঠিক করে।

এই পুজোর কাছাকাছি বেশ কয়েকটি বড় বড় পুজো হয় যেমন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, প্রদীপ সঙ্ঘ, অধিবাসীবৃন্দ। এই সব পুজোর প্রচার ও নামডাক খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু এর মধ্যে থেকেও দক্ষিণ পাতিপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব গান্ধী সেবা সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে আপন মহিমায় আন্তরিকভাবে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে চলেছে। গতবার মিউনিসিপ্যালিটির পুরস্কারও অর্জন করতে পেরেছে। এই পুজোর সন্ধ্যারতি দেখবার ও আনন্দ অনুভব করার মত হয়। পাড়ার যুবকবৃন্দের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সাধুবাদ জানাই।

সেবক
২৭ ভাদ্র ১৪২২ ● সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বন্ধনের প্রেরণায় ‘সেবক’

আপকা ভালা। সবকি ভালাই। আপনার ভালো। ভালো সবার। উদ্বোধনী বিজ্ঞাপনে লেপটে থাকা এই শব্দবন্ধকেই ব্যবসার মূল মন্ত্র করেছিল বন্ধন ব্যাঙ্ক। একলপ্তে চালু করে ফেলেছিল ৫০১টি শাখা। যার ২২০টিই এ বঙ্গে। বন্ধনের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষের যাত্রা সেই ২০০১ সালে কোন্নগর-বাগনানে জনা দুই কর্মী আর কাঠের একটি টেবিল নিয়ে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা চালুর দিন থেকে শুরু এখনকার এই উত্তোরণ। বছর চোদ্দো আগে সাইকেলে প্যাডেল ঘুরিয়ে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা শুরু করা চন্দ্রশেখরবাবু বলেছেন, ‘ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা হিসেবে গরিব মানুষকে এত দিন শুধু ঋণ দিয়েছি। আমানত সংগ্রহের জো ছিল না। ব্যাঙ্ক থেকে ১৩-১৪ শতাংশ সুদে ধার নিয়ে ঋণ দিতে হয়েছিল। আমানত এলে, মূলধন সংগ্রহের খরচ কমবে। ধীরে ধীরে কমানো যাবে সুদও।’ তাঁর যুক্তি, ‘আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা রেখে আপনি সুদ বেশি পাচ্ছেন। তাতে আপনার ভাল। আবার সেই টাকায় কিছুটা সস্তায় ঋণ পাচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ। ফলে ভাল সবারই।’ বিজ্ঞাপনের বয়ান মিলে যাচ্ছে হুবহু। বুদ্ধিজীবীর বাংলা থেকে এমন আগ্রাসী বাঙালি উদ্যোগপতিকে বেরোতে দেখে আমরা উৎসাহিত। আমাদের অঞ্চলে ক্ষুদ্র থেকে যাওয়া ‘সেবক’ পত্রিকাও একদিন আপনার ভালো, আমার ভালোর মত সেবায় নিশ্চয়ই পথিকৃৎ হয়ে উঠবে।

চিঠিপত্র

সবিনয় নিবেদন,
মহাশয়/মহাশয়া,
এই শ্রীভূমি ও লেকটাউন অঞ্চলের অধিবাসীরা গান্ধী সেবা সঙ্ঘের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্টই পরিচিত। গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণের প্রারম্ভে হাসপাতালের বহির্বিভাগটি চালু হয়ে গেছে প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত। এতদ্ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃত উপকার হয়েছে ওই বহির্বিভাগ শুরু হওয়াতে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা, এ অঞ্চলের মানুষেরা প্রয়োজনমত ওই বহির্বিভাগেই যোগাযোগ করে থাকি অসুখ-বিসুখ করলে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যা আপনাদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনতে চাই। আমি বা আমার মত কিছু রোগীর যেধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে ইদানিংকালে সেটা হল মাঝেমাঝেই ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছি। যোগাযোগ করে, নাম লিখিয়ে, ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করেছি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছি ওই দিন ডাক্তারবাবু আসতে পারবেন না। অসুস্থ শরীর নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও যদি ডাক্তার না দেখাতে পারি, তাহলে কি পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। যদিও সে অবস্থায় সেবা সদনের কর্মীরাও যথেষ্ট অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। এ পত্রের মাধ্যমে সমস্যাটার সমাধানের জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
নিবেদক,
সুভাষ পাল, লাহাবাগান, কলকাতা।

দুর্গাপুজোর অর্থনৈতিক প্রভাব

শঙ্করলাল ঘোষাল

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। কিন্তু শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসবের মধ্যে দুর্গাপূজা সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি জীবনের সমস্তরকম চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, কর্মসূচী, ভ্রমণ সব কিছু আচ্ছন্ন করে আছে দুর্গাপূজা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গাপূজার বিপুল অর্থনৈতিক প্রভাব এসে পরে বাঙালির আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রায়।

কবে কীভাবে দুর্গাপূজার প্রচলন বাংলাদেশে হয়েছে তা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার মালদহ অথবা নদীয়ায় দুর্গাপূজা শুরু হয় বলা যেতে পারে। শুরুতে দুর্গাপূজা রাজা অথবা জমিদার অথবা ব্যবসা-দারদের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হতো। তবে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের পুজোতে অংশগ্রহণ বিভিন্ন ভাবে প্রথম থেকেই ছিল। ১৭৯০ সালে হুগলির গুপ্তিপাড়ার বারো জন বন্ধু মিলে প্রথম পাড়ার পুজো প্রবর্তন করেন যার নাম হয় বারো ইয়ারি বা বারোয়ারি পুজো। কলকাতায় কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ ১৮৩২ সালে দুর্গাপূজা সম্মিলনী প্রথম চালু করেন। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন একত্রিত ভাবে দুর্গাপূজা শুরু করেন যার নাম হয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব। বাগবাজারের সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা এই অঞ্চলের অনেক বাসিন্দাদের নিয়ে ১৯১০ সালে এই বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব প্রথম শুরু করেন। তারপর থেকেই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে প্রথমে কলকাতা তারপর বাংলার অন্যান্য জেলায় এবং তারপরে বাংলার বাইরে দেশে ও বিদেশে এই সর্বজনীন দুর্গোৎসব -- বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে।

গত পঞ্চাশ বছরে সর্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসবের উল্লেখযোগ্য ক্রমবির্বতন হয়েছে। আমাদের ছোট বেলায় ১৯৬০-৭০ দশকে মেগা পূজার চল ছিল না। বেশ কিছু পাড়াভিত্তিক বিখ্যাত দুর্গাপূজা ছিল যেমন -- উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, আহিরীটোলা, কলেজ স্কোয়ার, বিবেকানন্দ রোড। আর দক্ষিণে পার্ক সার্কাস, ম্যাডক্স স্কোয়ার, কালীঘাট, ভবানীপুর, মুদিয়ালি ইত্যাদি। জোর ছিল কার দুর্গা প্রতিমা কত সুন্দর। প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জার গুরুত্ব ছিল কিন্তু সেটা ছিল আলঙ্কারিক। সর্বজনীন পূজার বাজেট ছিল সীমিত -- আনন্দ উপকরণ সবই ছিল পরিমিত। একটি সাধারণ সর্বজনীন পূজায় খরচ হোত ১ থেকে ২ লাখ টাকা, নামকরা পুজোয় হোত ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। এখন পুরো ছবিটাই বদলে গেছে। কলকাতায় সর্বজনীন পুজোর সংখ্যা ২০০০-এর বেশি। সারা পশ্চিমবঙ্গে ১০০০০-এর ওপর পুজো। সাধারণ একটি সর্বজনীন পুজোতেও খরচা পড়ে কমপক্ষে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা। মেগা পুজোর বাজেট ২ থেকে ৩ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। মেগা পুজোর সংখ্যাও মা ষষ্ঠীর কৃপায় দিন দিন বাড়ছে।

এ তো গেল কেবলমাত্র পুজো প্যান্ডেল ও পুজোর জন্য সরাসরি খরচের হিসেব।

কিন্তু দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে এক বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সারা বছর ধরে চলে। যেমন পুজো উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে জামা কাপড় থেকে শুরু করে সব ধরণের সামগ্রী, বৈদ্যুতিক ও শৌখিন সমস্ত জিনিসের বেচাকেনা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। রাস্তা ঘাট মেরামত, বাড়িঘর রং করা, দেশের মধ্যে ও বাইরে ভ্রমণ, পাড়ায় পাড়ায় বিচিত্রানুষ্ঠান, ভোগ প্রসাদ ভোজন ও বিতরণ, নানাধরনের প্রদর্শনী, বিজ্ঞাপন, কর্মশালা সমস্ত রকম কার্যকলাপ যেন দুর্গাপূজার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। তাই দুর্গোৎসবকে বর্তমান অর্থনীতির বিশেষজ্ঞগণ একটি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। পোষাকশিল্প, বস্ত্রশিল্প, খাদ্য প্রস্তুত ও বন্টনকারী শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প ইত্যাদি সব ধরণের শিল্পসংস্থাগুলোর ব্যবসা বাণিজ্য পুজোর সময় বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যায় -- যার প্রতিফলন হয় বড় বড় পুজোগুলোর ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। একটি সাধারণ হিসেব মতো প্রতিবছর এই মোট বেচা-কেনা প্রায় ২০ শতাংশ বাড়ছে। অ্যাসোচেম-এর একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যায় যে, ২০১৪ সালে দুর্গাপুজো উপলক্ষে যে ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন হয় তার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে বলা হচ্ছে যে, এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার ওপরে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক চালচিত্রে তাই দুর্গাপুজোর গুরুত্ব অপরিসীম। দুর্গাপুজো আজ আর কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গোৎসব হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ সমস্ত ধর্মের মানুষের এক অনবদ্য মিলনোৎসবে পরিণত হয়েছে -- যার প্রভাব পড়েছে বিরাটভাবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে। সারা পৃথিবীতে এই উৎসবের তুলনা মেলা ভার।

সিনেমায় শারদোৎসব

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (দে.মু.)

আবহ দুর্গা পুজোর: পথের পাঁচালীর একটি দৃশ্যের প্রস্তুতি। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে অপু (বাঁদিকে)।

মাত্র ৪৮ সেকেন্ড। ৪৮ সেকেন্ডেই এক বাঙালি পরিচালক তাঁর প্রথম ছবিতেই গোটা দুর্গাপুজোর দৃশ্যটি চিত্রায়িত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দুর্গাপুজো শুধু যে বাঙালির ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব সেটা প্রমাণ করতে শারদ উৎসবের আনুষঙ্গিক যাত্রার দৃশ্য ধরা থাকে প্রায় মিনিট আষ্টেক। মনে পড়ছে ছবির নাম? হ্যাঁ, 'পথের পাঁচালী'। ঢাকির ঢাক বাজানোর দৃশ্য দিয়ে শটটির শুরু। দেবী দুর্গার সনাতনী মুখ, বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরোয় দুর্গা-অপু, গ্রামের ছোটরাও দৌড়ে যায় -- প্রসাদ বিতরণ... আবার ঢাকিদের ঢাক বাজানো দেখিয়েই দৃশ্য শেষ। উৎসবের রেশ ধরা থাকে অপুর রাংতার মুকুটে। সত্যি বলতে সম্ভবত সেই প্রথম বাংলা ছবিতে দুর্গাপুজো এল সামাজিক-উৎসব হিসেবে। তার আগে সিনেমার আগমনের শুরু থেকে পৌরাণিক বা ধর্মীয় ভক্তিমূলক ছবি তৈরি হয়েছে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেই। কারণটা আবশ্যই আর্থিক। মহাকাব্যই হোক বা শাস্ত্র-পুরাণ, বই থেকে দেবদেবীকে পর্দায় দেখতে অজ্ঞ, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দর্শক ভিড় করে আসেন। ট্রিক শটে দেবদেবীর অলৌকিক ক্ষমতা দর্শকদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দেয়। তবে দেবী দুর্গার আখ্যানকে বিষয় করে খুব বেশি ছবি হয়নি। তার অন্যতম কারণ দেবীর দশ হাত। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে 'মা দুর্গা' নামে বাংলায় প্রথম ছবিটি করেছেন ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে জ্যোতিষ ব্যানার্জি ১৯২১ সালে। ১৯৪৫-এ শৈলজানন্দ পরিচালিত 'শ্রীদুর্গা' ছবিতে বিশেষত ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। বিজ্ঞাপনে বিষয়টির পৃথক উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় ততদিনে মহালয়ার প্রত্যুষে আকাশবাণী প্রচারিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' বাংলার মানুষের কাছে দুর্গোৎসবের আগমনী-বার্তা হয়ে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এবং সেই কারণেই এর সাত বছর পর হরি ভঞ্জ পরিচালিত 'মহিষাসুর বধ' ছবিতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভূমিকা হয় কাহিনী, সংলাপ

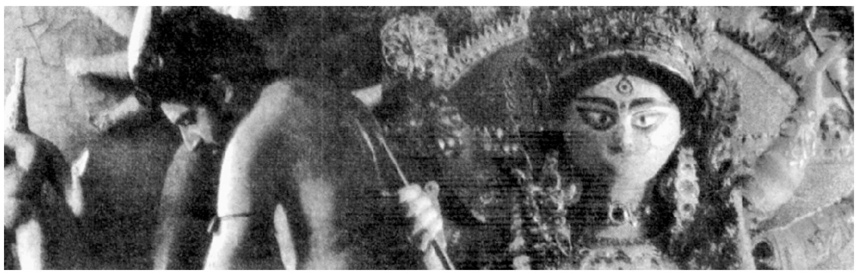

ও চণ্ডীপাঠের। যদিও ছবিটি অন্য কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। ছবিতে কমল মিত্র মহিষাসুর ও দুর্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন পদ্মা দেবী। দেবীর অলৌকিক আখ্যান নিয়ে সামাজিক রঙিন ছবি 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮১-তে। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দুর্গার পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ এই চারটিই। তবে 'শিবশক্তি', 'কমলে কামিনী', 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'-র মতো কয়েকটি ছবিতে দুর্গার আখ্যান কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা গেছে।

'পথের পাঁচালী'-র পর থেকেই দুর্গাপুজোকে ইতিহাসে এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখাবার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবিতে দুর্গাপুজো এসেছে ঐতিহাসিক কারণে। সামাজিক মিলনোৎসব হিসেবে দুর্গাপুজোকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকটি ছবিতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে মা দুর্গা বাপেরবাড়ি ফেরেন এই লোক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস বাঙালিরা সত্যি বলে মেনে নিয়ে এই শারদোৎসবেই প্রবাসী বাঙালিরা ঘরে ফিরে আসেন শিকড়ের টানে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সেই দৃশ্যটি স্মরণ করুন। কাশীর বিখ্যাত বনেদি পরিবার ঘোষালবাড়িতে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন ফেলুদা তাঁর দুই সঙ্গী নিয়ে। তোপসে বৈঠকখানার পর্দা সরিয়ে দেখে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে। পরের দৃশ্যেই দেখি বাড়ির মালিক উমানাথ ঘোষাল আশ্রিত কাজের লোকটিকে বলেন, 'সপ্তমীর দিন দুনে আসছে বেনে আর মেজদিরা অমৃতসর এক্সপ্রেসে -- তুমি দুটোই অ্যাটেন্ড করবে।' পারিবারিক মিলনের শর্তটি এই টুকরো দৃশ্যতেই মুনশিয়ানার সঙ্গে চমৎকার বুঝিয়ে দেন সত্যজিৎ রায়। এমনি শারদ উৎসবে বাড়িতে আসার ঘটনা দেখা যায় ঋতুপর্ণ ঘোষের দুটি ছবিতে। প্রথমটি 'হীরের আংটি'। ছবির শুরুতেই দেখা যায় পর্দার প্রান্তসীমা ছুঁয়ে ট্রেন যাচ্ছে ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে। নেপথ্যে ভেসে আসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জলদ কণ্ঠস্বর, 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোকসঙ্গীত। ধরণীর বহিরাকাশে আন্তরিক মেঘমালা।

প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমনবার্তা।' নিমেষে রোমাঞ্চিত স্মৃতি আমাদের বুঝিয়ে দেয়, সময়টা দেবীপক্ষের শুরু। ছবির প্রেক্ষাপটও পুজোয় দেশের বাড়িতে একত্রিত হওয়া। বাঙালির এই গর্বিত ঐতিহ্য ঋতুপর্ণর 'উৎসব' ছবিতে আবার দেখা যায়। দেড়শো বছরের পুরনো এক বনেদি বাড়িতে পুজো এবং বাড়ির সদস্যদের মানসিক টানাপোড়েনের ছবি 'উৎসব'। 'অন্তরমহল' ছবির কেন্দ্রেও আছে দুর্গাপ্রতিমা।

সত্যজিতের 'দেবী' ছবিতেও দুর্গা মূর্তি এসেছে ছবির শুরুতে টাইটেল দৃশ্যে। দামোটে সাদা মুখ দেখিয়ে টাইটেল শুরু। একে একে ফুটে ওঠে চোখ, মুখ, গহনা, মুকুট। দেবিত্ব আরোপ হওয়ার পরেই দেবিমুখের সামনে দেখা যায় ধূপের ধোঁয়া। ক্যামেরা পিছিয়ে আসতেই দেখা যায় ঠাকুর দালানে দেবীর সামনে বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরাও। এমনি আর একটি অসাধারণ টাইটেল দৃশ্য শুরু হয় সপ্তমীতে দেবী দুর্গার 'ক্লোজ আপ' দেখিয়ে। টুকরো টুকরো মন্তাজে অভিজাত এক বনেদি বাড়ির পুজোর আবহাওয়ার মধ্যে নাম দেখানো। দশমীতে প্রতিমার বরণ দিয়ে টাইটেল দৃশ্য শেষ। অর্পণা সেনের 'পরমা'।

ছবি: লেখক

AGNI

An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company

MNRE, Govt. Of India Accreditated Channel Partner

AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.

Leader in Solar PV Engineering

HEAD OFFICE:

114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107

Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038

E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

কুমারটুলি ডট কম

প্রদ্যোৎ পাল

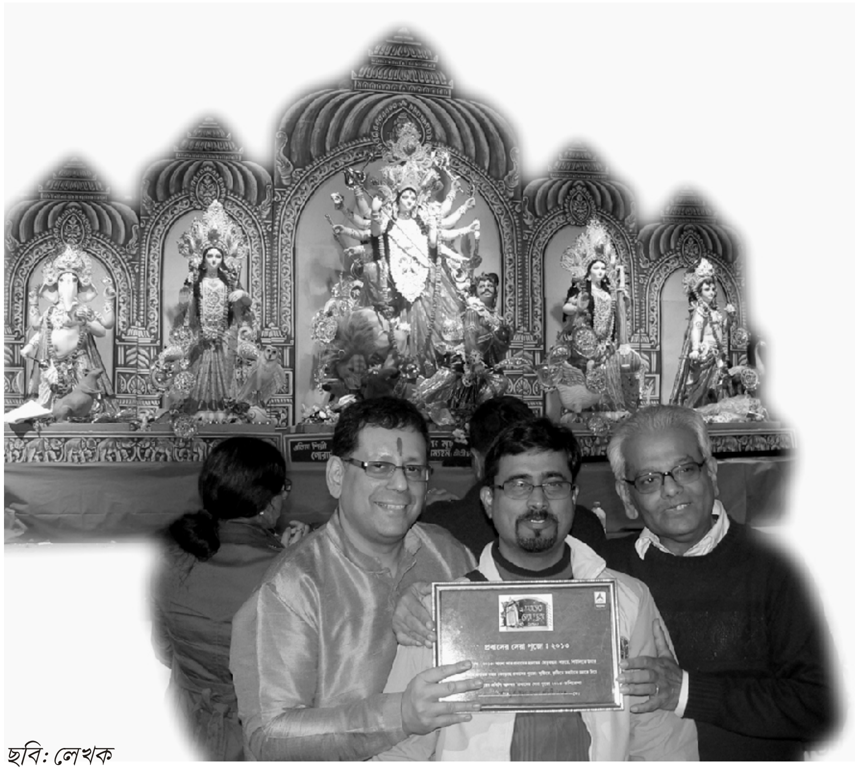
ছবি: লেখক

ব্যবসা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য, পরম্পরা। তাই ছোটবেলা থেকেই একটা ব্যবসায়িক মানসিকতা কি জানি কিভাবে আমায় আকৃষ্ট করত। শুধু ভাবাতো, অর্থ উপার্জনই যেন আমার ব্যবসার মূল অবজেক্ট না হয়। এমন একটি ব্যবসা করতে চাই, যা এই মহাবিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারি। বিশ্বপরিক্রমায় নিজেকে সামিল করতে পারি। কলেজে পড়াকালীনই ওই বিশেষ ভাবনা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। চলছিল। পরে আস্তে আস্তে পুরোপুরি পারিবারিক ব্যবসা প্রতিমা তৈরিতে ঢুকে পড়লাম। ততোদিনে সাবেকি প্রতিমাকে দমিয়ে রেখে থিমের ভিড়ে কুমারটুলিতে তখন মা-দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী সেই বিশাল নয়নের মাতৃরূপেন প্রতিমার ব্যবসা নিম্নমুখী। ভাবতে শুরু সেখান থেকেই। তারপরেই ভাবনাচিন্তা, কিভাবে ব্যবসাটা আরও বিশাল দুনিয়ার কাছে তুলে ধরা যায়। সেই বিশাল দুনিয়াকে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরতে নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য কম্পিউটার শেখা। নেট ঘাটাঘাটি শুরু। বিভিন্নভাবে তথ্য জোগার করতে করতেই তথ্যের আদান-প্রদানের সুবিধার্থে তৈরি করলাম নিজেদের ওয়েবসাইট kumartuli.com। দুনিয়াজুড়ে প্রতিযোগিতা! মার্কেটিং-এর প্রাথমিক দিনগুলি এখনও মনে পড়ে। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়েছিল। সেদিনের কথা ভাবলে এখনও নিজের ওপর অগাধ আস্থার কথা মনে পড়ে। কেন জানি না, সেদিন থেকেই আমার মনে হত, আমি হারতে পারি না! হারবোই বা কেন? এসে গেল ২০০৪ সাল। আমার তৈরি প্রথম ফাইবারগ্লাসের পাঁচচালা দুর্গা প্রতিমা আমেরিকার টেক্সাসের ডালাস শহরে 'আন্তরিক' নামে একটি বাঙালি ক্লাবে পাঠাবার সুবর্ণ সুযোগ।

এরপর আর থেমে থাকতে হয়নি। এরপরই সারা বিশ্বে একটা হইহই পড়ে গেল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু হয়ে হল আমাদের ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। দেশি-বিদেশি মিডিয়া ও বিদেশের বাঙালি ক্লাবগুলি নিয়ম করে খোঁজ নিতে শুরু করলো। কুমারটুলি থেকে দেশের সর্বপ্রথম ওয়েবসাইট তৈরি করে বিদেশে দুর্গা প্রতিমা পাঠানোর খবর ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বজুড়ে। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, থাইল্যান্ড, সাইপ্রাস, নেদারল্যান্ড ও আরও অনেক যোগাযোগ আসতে লাগল। আমার তৈরি প্রতিমা আজ পর্যন্ত সব থেকে বেশি পাঠিয়েছি আমেরিকাতে। এছাড়া অন্য দেশের মধ্যে আছে যথাক্রমে: ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশ।

ব্যবসা শুরুতে আমার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকেই প্রতিমার অর্ডার আসুক না কেন, প্রতিমা তার বাড়িতে বা তাদের প্রতিষ্ঠানে আমরাই পৌঁছে দেব। প্রতিমা কেনার বা বিদেশে পাঠানোর জন্য তাকে কুমারটুলিতে আসতে হবে না। এতে ক্রেতাদের পরিশ্রম, সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হবে। তাই আধুনিক, উন্নত পরিষেবার কথা মাথায় রেখেই ইমেলে অর্ডার নেওয়া, স্ট্যাটাস দেওয়া ও নেট ব্যাঙ্কিং-এ অর্থ নেওয়া, সবটাই আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে ব্যবসার বিস্তারে নেমে পড়লাম। এভাবেই চলতে চলতে আরও একটি লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ। আমারই তৈরি প্রতিমাকে সঙ্গে করে বিদেশ ভ্রমণ। সারা দুনিয়া ঘোরার ভাবনাচিন্তা। অবশেষে ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের কার্ডিফ শহরের মিউজিয়ামে বসে প্রতিমা সাজানোর সুযোগ যেদিন পেয়েছিলাম, মনে পড়ে, সে রাত আমি আনন্দে ঘোমাতে পারিনি। ওখানকার এক বাঙালি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনায় ২০ দিন ধরে প্রতিমা সাজানোর আয়োজনের আনুরোধ এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য তখনও আমাকে যে ছেড়ে চলে যায়নি সেদিন তা পলে পলে অনুভব করলাম যখন দেখলাম আমার কাকা শ্রী গোপালচন্দ্র পালের পাসপোর্ট আটকে গেল। মুষড়ে পরেছিলাম! কিন্তু ভেঙে পড়িনি।

বিমর্ষতা কাটিয়ে উঠে নতুন করে লক্ষ্য নিয়ে আবার শুরু করলাম। অবশেষে ২০১৩ সালের ঘটনা। আমার রঙিন দিনের শুরু। বিশ্বখ্যাত স্বনামধন্য ব্যবসায়ী মাননীয় লক্ষ্মী মিত্তালের সহায়তায় ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে আমন্ত্রণ পেলাম সেখানে প্রতিমা তৈরি করতে হবে। এবং ওখানে বসেই সেটিং করতে হবে। যাত্রা শুরু করেছিলাম ৯ই অক্টোবর ২০১৩। লন্ডনের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল আরও একটা স্বপ্ন আমার পূরণ হল। ওখানকার ক্যামডেন সেন্টারের সেই ৫০ বছরের পুজোতে প্রবাসী বাঙালিদের সকলের সঙ্গে পাঁচদিন কাটিয়েছিলাম। সেবার বিদেশের মাটিতে সেরা প্রতিমা হিসেবে গণ্য হয়েছিল আমার তৈরি সেই প্রতিমা। অবশেষে ১১ দিন ইংল্যান্ড ভ্রমণ করে অনেক উচ্ছ্বাস, আনন্দে মোহিত হয়ে কলকাতায় ফেরা।

পারিবারিক ব্যবসা সূত্রেই আমার এই প্রতিমার ব্যবসায় আসা। ছোটবেলা থেকে দাদু, বিখ্যাত শিল্পী ঁগোরাচাঁদ পাল-এর সঙ্গে থেকে থেকেই আমার এই কাজের বেশির ভাগ অংশ শেখা। আমার পিতা শ্রী গৌরচন্দ্র পাল ও কাকা গোপালচন্দ্র পাল তাঁদের অবদানও কম নয় আমার এই কর্মজীবনে। আগামীদিনে আরও একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছি। যেদিন তা পূরণের কাছাকাছি আসবো সেদিনই সকলকে আবার জানাব। আজ নয়। আজ আশা করছি, একান্তভাবে আপনাদের ভালবাসা ও আশীর্বাদ।

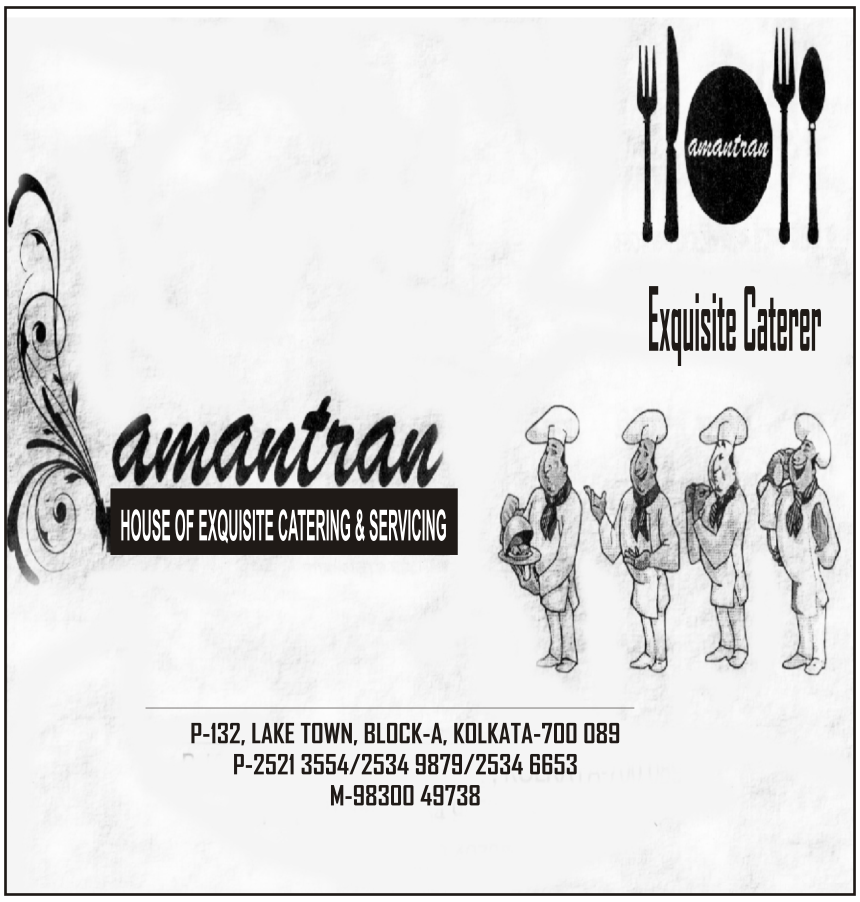

ক্ল্যাসিক্যাল • সেমি-ক্ল্যাসিক্যাল • রবীন্দ্রনৃত্য • ফোক
এই সব নৃত্যশৈলী যত্নসহকারে শেখানো হয়
তত্ত্বাবধানে
পায়েল মল্লিক মজুমদার
দূরদর্শন গ্রেডেড শিল্পী
রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি প্রাপ্ত এবং সঙ্গীতবিভাকর পুরস্কৃত
স্থান: গান্ধী সেবা সঙ্ঘ
সময়: বিকেল ৫-৩০ মিঃ (প্রতি বৃহস্পতিবার)
যোগাযোগ: ৯৮৩০০ ৫৭৩৩৫

হ্যাঁ... এটাই সত্যি ! আপনি আসছেনই...

নীতিশ মুখার্জি

আপনি কি উল্টোডাঙ্গা থেকে এয়ারপোর্টের দিকে চলেছেন? ঠাকুর দেখতে? তাহলে নামছেন গোলাঘাটায়। অথবা এয়ারপোর্ট থেকে সুদূর দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভি আই পি রোড ধরে এগিয়ে চলেছেন উল্টোডাঙ্গার দিকে? মাঝে ঠাকুর দেখবেন? তাহলে আপনাকে নামতেই হবে দমদম পার্ক বাসস্টপে। যেদিক থেকেই আসুন, পথে আপনাকে সাতটি ক্লাবের পুজো দেখতেই হচ্ছে। এই সাত ক্লাবই সাতরঙের ছোঁয়ায় বিপুল মানুষকে রাঙিয়ে তুলে আসছে গত বেশ কিছু বছর ধরেই। পুজো-প্রতিযোগিতার পুরস্কারও বাঁধা থেকেছে এই সাত ক্লাবের কোনও না কোনওটাতেই। যদি দমদম পার্কেই থামেন, গাড়ি রেখে ঢুকে পড়ুন দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে। আর উল্টোডাঙ্গা থেকে এয়ারপোর্টের দিকে হলে আপনি থেমে যান গোলাঘাটা বাসস্টপে। গোলাঘাটা সম্মিলনীর পুজো। সনাতনী প্রতিমাকে

নতুনপল্লী প্রদীপ সঙ্ঘ

শিল্পীর চোখে যে মৃণ্ময়ীরূপে জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়, তা অমর সরকারের কাজ না দেখলে ভাবতে পারবেন না। তাই এবার আপনাকে আসতেই হবে গোলাঘাটা পুজোমণ্ডপে। সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিককে জড়িয়ে নিয়ে সে এক মায়াময় ভুবন। পুজোর ক্যাপশন হয়েছে 'ঝালাপালা'। গোলাঘাটায় যদি আপনার কান না হোক মনের ঝালাপালা ঘটেই যায় তাহলে সেখান থেকে বেরিয়েই পাচ্ছেন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব।

সেই স্বর্ণালি আলোর সকালে সৌভাগ্যের পরশ যখন লাগছে সবার কপালে, লাগছে প্রাণে যখন খুশির ছোঁয়া, কঠিন হলেও, এবারের পুজো উঠবেই মেতে প্রাঙ্গণে-প্রাঙ্গণে শঙ্খরবে। নীল আকাশে ভাসতে শুরু করেছে মেঘের ভেলা। কাশের গুচ্ছ খেলা শুরু করেছে রোদের সঙ্গে। বাহারি আলোয় রাতগুলো হবে আলোকিত, বাতাসে বাজবেই আগমনী গান সুললিত। দেবী দুর্গার সনাতনী মৃণ্ময়ী মূর্তি মনে জাগাবে মহোৎসবের মহান ফুর্তি।

এবার পুজোয় ভেবেই নিয়েছিলাম মজে যাব আরও আড্ডায়, আরও মজা, আরও আনন্দে মেতে উঠবো 'সেবক'-এর টিমসহ সম্পাদকের উপস্থিতিতে। অবশ্য যদি ফোনে ধরতে পারি। শারদ শুভেচ্ছার চিঠি এখন আর কেউ পাঠায় না ডাকে। একটাও চিঠি এখনও পর্যন্ত পেলাম না। প্রণাম কিংবা আশীর্বাণীর ছত্রে। যাকে ভালোবাসি, ই-মেল পাঠাই তাকে। বাংলায় নয়, পারলে রোমান হরফে লেখা ইলেকট্রনিক পত্র! পাশেই রয়েছে ফেসবুক! নিত্য

লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ

আপলোড করা প্রতিমার মুখ -- মন্ত্র। দেখে-শুনে-পড়ে অবিরল ভরে উঠছে মন। দিন বদলাচ্ছে, যুগ বদলেছে, মানছি বদলায় সবই, স্ট্যাটিক তো নয় কিছুই, তাই রোধ করে কার শক্তি? এরই পাশাপাশি টেনে আনতেই হচ্ছে বদলে যায়নি মাতৃপূজার ভক্তি! শ্রীভূমির সনাতনী দুর্গার বিশালত্ব।

এ পুজো সম্বন্ধে বলতে গেলেই পিছিয়ে যেতে হয় গত দু'বছরের ইতিহাসে। যেবার সেই বিশাল প্রতিমাকে পরানো হয়েছিল আসল সোনার গহনা। সুপরিচিত স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর উদ্যোগে প্রতিমার সমস্ত অলঙ্কার গড়ার পাশাপাশি মাথার মুকুটটি ছিল সোনা-আবৃত। ঠিক পরের বারই প্রতিমাকে সাজানো হয়েছিল হীরে দিয়ে। প্রায় কুড়ি কোটি টাকার হীরের গহনাতে সুসজ্জিত প্রতিমা দর্শনে ভিড় উপচে পড়েছিল সারা রাত ধরেই। আর এবার? প্রচার পেতে শুরু করেছিল, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তাহলে এবার নিশ্চয়ই প্ল্যাটিনামে সেজে উঠবে মা দুর্গা! বাংলার যে চারটি পুজো ভিড়ের নিরিখে সব সময়েই সর্বোচ্চ বলে খ্যাতি পেয়েছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব তারই একটি।

সেলিমের সঙ্গে দেখা। ও বলছিল, আপনাদের দুর্গাপুজো আর আমাদের ঈদ। এবার একটু আগেভাগেই পরব বেঁধেছে। পুরভোট হতে না হতেই বড় ভোটের বাদ্যি বেজে যাবে। দেশসুদ্ধ মা মা আওয়াজ উঠবে। আরও উঠবে। পাঁচতলার বারান্দায় পরিবারসহ গান প্র্যাকটিস করছিলাম। গানের কলি... সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং... পাশের ফ্ল্যাটের পোষ্য মেয়ে কুকুরটা তখন কতকটা আর্তস্বরে ডেকে উঠে ব্যাঘাত ঘটিয়ে বসেছিল। সবে পাড়ায় দুর্গা আসার প্রস্তুতি হয়েছে। যদি এভাবে গান-প্র্যাকটিস চালিয়ে যাই, পাড়ায় দুর্গা এসে চমকে ভাববে না তো গানের কথাগুলো সব ঠিকঠাক হচ্ছে কি না! কারণ, বাতাসে গন্ধ পরিবর্তন হচ্ছে। আকাশে মেঘ নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছে। সাজিয়ে সাজিয়ে কখনও ক্রিস গেইলের মত অসুরের আকার নিচ্ছে। আর

শ্রীভূমি

মা দুর্গার রূপে যে মেঘ গড়ে উঠছে, তাতে আমি আমারই দুর্গাকে দেখছি। ...হ্যাঁ, সেই তো 'সেবক'।

শ্রীভূমির ঘোর কাটতে না কাটতেই এস কে দেব রোড ধরে আপনি পৌঁছে যাবেন নতুনপল্লী প্রদীপ সঙ্ঘের পুজোতে। এখনও পর্যন্ত পুরস্কারের তালিকায় অঞ্চলের সর্বোচ্চ। তিন-তিনবার এশিয়ান পেইন্টস পুরস্কারে ভূষিত। ২০০৬ সালে আনন্দবাজারের চারটি পুরস্কারই নতুনপল্লী প্রদীপ সঙ্ঘের ঝোলায়। পুজোর ইতিহাসে ঘটনাটি বিরল। পুজোর থিম: 'তেভাগা থেকে তেলেঙ্গানা'। ওয়াওঃ! সেই দুনিয়া কাঁপানো তেভাগা আন্দোলন! উৎপাদনের তিন ভাগের দুই ভাগ দিতে হবে কৃষককে। আর একভাগ জমিদারের। যা জমিদাররা কখনই মানতে পারছিলেন না। আর তেলেঙ্গানায়? অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে জমি দখলের লড়াই। পি সুন্দরাইয়া আর রাজেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে বামপন্থীদের নিবিড় আন্দোলন এবারের পুজোয় পার্থপ্রতিম রায়ের ভাবনায় উঠে আসবে প্রদীপ সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে।

ঢাকে কাঠি পড়তে আর বাকি ক'দিন। চারিদিকে কেমন যেন সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আর তারই মধ্যে আগমন আনন্দ বার্তার। দেশের ভবিষ্যতের দিশারী তৈরি হতে চলেছে নানান রূপে। নতুনপল্লী প্রদীপ সঙ্ঘের পুজো দেখে আপনি বেরিয়ে পড়ুন লিঙ্ক-রোড ধরে জয়া সিনেমা হলের দিকে। খানিকটা এগোলেই পাচ্ছেন লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ। এই পুজোর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে অঞ্চলের মানুষের মনে-প্রাণে। এবারের শিল্পী নয়ন মিত্যা। 'বঙ্গের নানান উৎসব মেলা/রেশমী সুতোয় শিল্পকলা' -- এই মুখবন্ধকে সামনে রেখেই গড়ে উঠছে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের পুজো প্রাঙ্গণ। নানান পুজো-পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দু-দু'বার এশিয়ান পেইন্টস পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল লেকটাউন আধিবাসীবৃন্দ।

নবরূপে দেবীর আরাধনায় যে শক্তি ভূষিত মহারত্নে। মানবজীবনের আনন্দের এই সমাগমে তাই বসেছে মহারত্নের মেলা...মহোৎসবে। এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই ঢুকে পড়েছেন দমদম পার্কে? এখানে তিনটি ক্লাবের পুজো আপনাকে মুগ্ধ করবেই। দমদম পার্ক ভারতচক্র, দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘ এবং

দমদম পার্ক ভারতচক্র

দমদম পার্ক যুবকবৃন্দ।

দমদম পার্ক ভারতচক্রে এবার শিল্পী শিবশঙ্কর দাস। শিল্পীর ভাবনায় ভারতচক্রের স্লোগান -- 'সাতরঙে রাঙাবো এবার'। এই পুজোর ইতিহাস বহুদিনের। বিশাল বাজেট না করেও ভারতচক্রের পুজো বেশ কিছু বছর ধরেই মানুষকে টানছে নিবিড়ভাবে। এশিয়ান পেইন্টস পুরস্কারও পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত ভারতচক্রে আপনি নিজেকে রাঙিয়ে নিতে পারবেনই। একটু ঘুরেই ওখান থেকে সরাসরি ঢুকে পড়ুন দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে। পুজোশিল্পী হিসেবে যাঁর খ্যাতি গগনচুম্বী। সার্বিক ভাবনায় অমর সরকারের তুলনা হয় না। সুদূর দক্ষিণ থেকে অমর এবার উত্তরে। পুরস্কার আসবেই। থিম পুজোর একজন পথিকৃৎ অমর সরকারের তত্ত্বাবধানে দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘের পুজোর স্লোগান: 'উৎস থেকে মোহনা/নর্মদা পরিক্রমা। তরুণ সঙ্ঘের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

একটু পাশেই দমদম পার্ক যুবকবৃন্দ। দীর্ঘ ইতিহাস না থাকলেও গত কয়েক বছর ধরেই থিম পুজোর আসরে আসন করে নিতে পেরেছে এই যুবকবৃন্দের দল। এবারের শিল্পী টুকাই ও ছোটু। জুটিতে লোটার প্রয়াস নিশ্চয়ই থাকবে। পুজোর থিমে তাই তাঁরা রেখেছেন -- 'শিশু মনের ভাবনায়/এবার মাকে সাজাবো আয়'। এশিয়ান পেইন্টস পুরস্কারের তালিকায় শর্টলিস্টে থেকেছে। এছাড়া অন্যান্য পুরস্কার পাওয়ার অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়েছে। এই সাত রঙে রাঙানো সাতটি পুজো কমিটির প্রতিটিই রইল অগাধ

দমদম পার্ক তরুণসঙ্ঘ

আস্থা। যাঁরা ঠাকুর দেখতে আসবেন তাঁরা নিরাশ হবেন না। আস্থা রূপেণ সংস্থিতা। দিদিমণি, একেই বলে সাম্যবাদ। সকলের জন্য সমান আশীর্বাদ। হ্যাঁ... এটাই সত্যি!

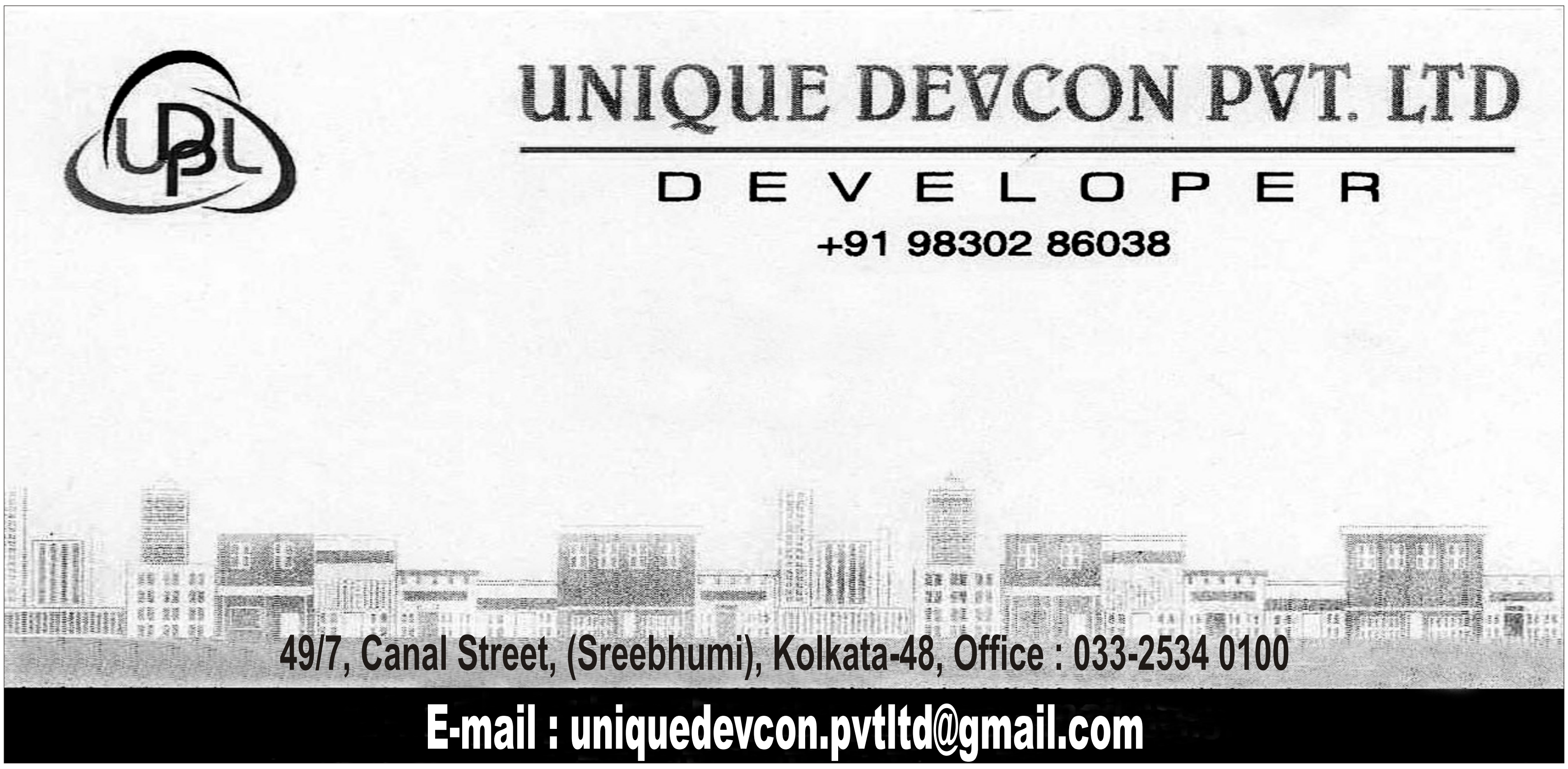

A Welfare Endeavour of Gandhi Seve Sangha

GSS HOSPITAL OPD SERVICES

DOCTORS & TIME SCHEDULE	**GANDHI MORE, SREEBHUMI, KOL 700 048**	
MEDICINE		
Dr. Sudipta Chattopadhyay	MD(Med), DNB(Med)	FRI 4-6 PM
Dr. Subhadip Pal	MD, MRCGP	TUES 5-7 PM
DIABETOLOGY		
Dr. S. B. Roy Choudhury	MBBS, MRCP, MSc (Diab), PGDIP	TUES 4-6 PM
Dr. B. K. Gupta	MD, (Gold Medalist)	
CARDIOLOGY		
Dr. Swapan De	MD, DM	MON 7-8 PM, THURS 4-5 PM
Dr. Sumit Acharya	MBBS, MD(Med), MRCP(UK), MRCP(Ireland), MRCP(Galsgow)	MON & FRI 4-6 PM
Dr. Anirban Kundu	MBBS, DIP CARD	SAT 10-12 AM
GASTROENTEROLOGY		
Dr. Sabyasachi Ray	FRCPI, FACP	THURS 7-8 PM
Dr. Subhabrata Ganguly	MD, DM	TUES 6-8 PM
ORTHOPAEDIC		
Dr. Malay Mandal	D.ORTHO, MS(Ortho), MRCS(Ed)	TUES 9-10 AM
Dr. Sudipta Bandhopadhyay	MS(Ortho)	THURS 10-11 AM
GYNAECOLOGY & OBSTETRICS		
Dr. Ashok Mandal	MD, DGO, FSMF	TUES & FRI 12 AM-1 PM
Dr. Partha Mitra	MD, DGO	SAT 7-8 PM
Dr. Bandana Pal	MBBS, DGO	WED & FRI 6-7 PM
Dr. Trina Sengupta	MBBS, DGO, DNB	THURS 4-6 PM
Dr. Suchismita Das	MBBS, DGO	TUES 4-5 PM, WED 9-11 AM
PAEDIATRIC		
Dr. R. K. Biswas	MD, DCH	FRI 10-12 AM
CHEST MEDICINE		
Dr. A. C. Kundu	MBBS, DTCD(Cal)	MON 4-5 PM
FAMILY MEDICINE & SKIN		
Dr. Joy Basu	MBBS, DNB, FRSM(London)	MON 6-8 PM, THURS 6-8 PM
Dr. Subhas Kundu	MBBS, DVS, ISHA(Bangalore)	TUES 11-12 AM
SURGERY		
Dr. Diptendu Sinha	MS, FAIS	MON, WED 11 AM-1PM
ONCOLOGY		
Prof. Dr. Anup Majumdar	MD(Cal)	WED 11 AM-1 PM
Prof. Dr. Srikrishna Mandal	MD(PGMIR, Chandigarh)	TUES 7-8 PM

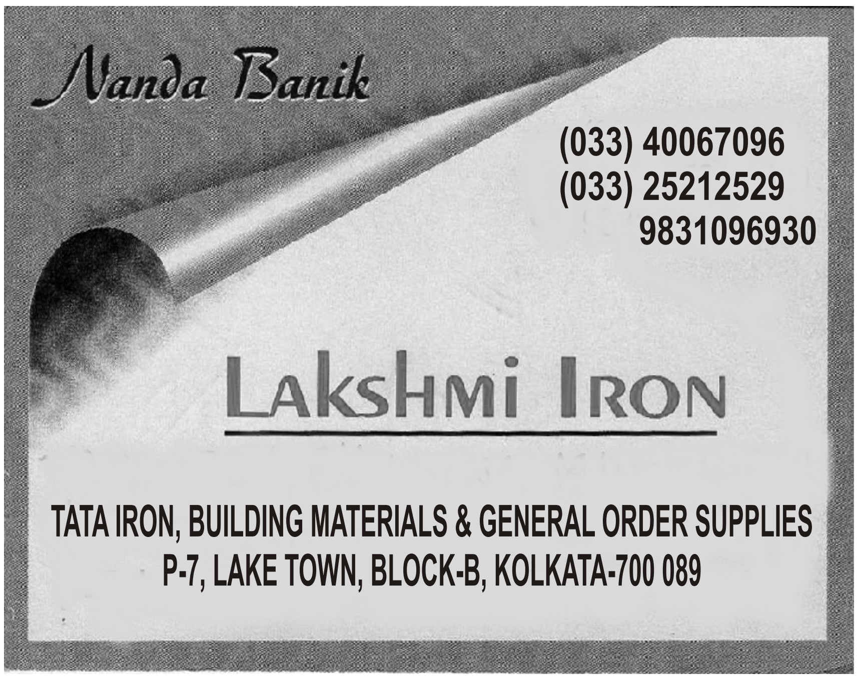

ENT
Prof. Dr. Ajit SahaMBBS(Gold,MS, DLO (London) Rcs, (Eng). MS (Eng)TUES, Thurs, 10am-12pm
Dr. Debarshi Roy MS (Gold), MRCS, UK, DOHNS UK Fri. 10-11AM
EYE
Dr. Saibal maitra MS (OPHTH) Wed. 6-7PM Sat. 5-60PM
Dr. Rupam Roy MS (OPHTH), Mon 6-8PM
Gen. Physician
Dr. Sujay Mukherjee Every day
Dr. Suman Kumar Guha ,,
Dr. Saradi Banerjee ,,
Dr. Indranil Basak ,,
Dr. Sayantan Manna ,,

OPD opens MON to SAT, 9 AM-1 PM, 4-8 PM.
Appointment & Enquiry 9903321777, 9836066910.
Doctor consultation fees Rs.100, 150, 200 only. All diagnostic tests at high discount rate.
For details visit www.gandhisevasangha.org; mail to gandhisevasangha1946@gmail.com; or contact Goutam Saha, Secretary 9432000260.

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika @ gmail.com